দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বৃত্তান্ত

প্রকাশিত: ২৮ - মে, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

- সাজ্জাদ কাদির

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোন কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদটি গণমাধ্যমের সুবাদে দেশবাসীর কাছে এক চরম অস্বস্তির খবর দিচ্ছে। কোন কোন উপাচার্যের কর্মকান্ড এতটাই বিতর্কিত যে আমরা দেশবাসী ভালভাবে নিতে পারছি না। পৃথিবীতে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, গবেষণার আঁতুড়ঘর বিশ্ববিদ্যালয়। এই সবকিছুর বিশ্বজনীন চর্চাটিই হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশ্বজনীন এবং সর্বজনীন ধারণা। সারা পৃথিবীতে নতুন নতুন জ্ঞান উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে চলেছে। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহার লাল নেহরু বলেছিলেন, 'একটি দেশ ভাল হয় যদি সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভাল হয়।' পৃথিবীব্যাপী নেহরুর তাৎপর্যপূর্ণ কথাটির বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও নেহরুর কথাটি শতভাগ বাস্তব। দেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে চলেছে, মানুষের জীবনযাত্রা, মাথাপিছু আয়সহ উন্নতির সকল সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেশে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, গবেষণার কতটা উন্নতি হচ্ছে, সে ব্যাপারে এ দেশের সচেতন নাগরিক সমাজ সহজেই অনুধাবন করতে পারছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্তা ব্যক্তিটি হচ্ছেন উপাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গার প্রধান কর্তা ব্যক্তিটি যদি নিয়োগ লাভের অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বিতর্কিত হয়ে পড়েন তা হলে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক গতিপথ বাধাগ্রস্ত হবে, এটাই স্বাভাবিক। আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে তাই হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আলোচনাতে নিয়ে আসতে চাই না। কারণ হাতেগোনা কয়েকটি ছাড়া প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্তা ব্যক্তি উপাচার্য পদটির নিয়োগ কী স্বাভাবিক নিয়মে হচ্ছে? এর উত্তর হবে না। কারণ গোড়ায় গলদ রয়ে গেছে। ৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট তিনজনের একটি ভিসি প্যানেল নির্বাচন করবে। তিন জনের মধ্য থেকে একজনকে রাষ্ট্রপতি বা আচার্য উপাচার্য পদে নিয়োগ করবেন এটিই আইন। কিন্তু বর্তমানে সিনেট নিয়েই যথেষ্ট প্রশ্ন রয়ে গেছে। কারণ যে সময় এই অধ্যাদেশটি জারি করা হয়েছিল সেই সময়ের প্রেক্ষিতে আইনটি হয়ত ঠিক ছিল। কিন্তু এখন সময় বদলেছে। এখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে সেই সরকারের একটি রাজনৈতিক অঙ্গাবহ বডিতে পরিণত হয়েছে সিনেট। এই সিনেট থেকে যে প্যানেলটি নির্বাচন করা হয়, সেটি অতিমাত্রায় রাজনৈতিক শিক্ষকদের মধ্য থেকেই নির্বাচন করা হয়। এই রাজনৈতিক শিক্ষকদের মধ্য থেকে উপাচার্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে কেউ কেউ ভাল করলেও অনেকেই অতিমাত্রায় বিতর্কিত কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছেন। এই বিতর্কিতরা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাল রাখতে পারছেন না। ইদানীং সিনেটে উপাচার্য প্যানেলটিও নির্বাচন করা হয় না। অর্থাৎ ৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে যে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি ছিল, সেটি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। তা ছাড়া ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর- এই পুরনো চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ই কেবল ৭৩-এর অধ্যাদেশ দ্বারা পরিচালিত হয়। এখন বলতে গেলে পুরনো, নতুন সব বিশ্ববিদ্যালয় অনির্বাচিত উপাচার্য দিয়েই চলছে মেয়াদের পর মেয়াদ। পৃথিবীর কোন দেশে আমাদের দেশের প্রক্রিয়ায় উপাচার্য নিয়োগ পদ্ধতি চালু আছে কী-না, তা আমাদের জানা নেই। নিয়মকানুন, আইন যেটাই বলি না কেন সব কিছু নিশ্চয়ই কল্যাণের জন্য। ৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়াটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে এখন আর কাজে লাগছে না। কাজেই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই আইনটি যুগোপযোগী করে পরিবর্তন প্রয়োজন এবং নতুন-পুরনো দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় একটি যুগোপযোগী আইন দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। উপাচার্য্য নির্বাচিত বা অনির্বাচিত যাই হোক না কেন এই পদটি এখন সরাসরি রাজনীতি ঘেঁষা পদে পরিণত হয়েছে। সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়ন এমনকি কোন কোন উপাচার্য দ্বারা সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মতো ঘটনাও ঘটছে। যদিও ৭৩-এর অধ্যাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের রাজনীতি করার অধিকার রেখেছে, তার পরেও শালীনতাবোধ বলে একটা কিছু নিশ্চয়ই থাকা উচিত।

উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়াটির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াটিও এখানে খানিকটা আলোচনা হওয়া দরকার। কারণ এই নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণই জীবনের একটি পর্যায়ে উপাচার্য হওয়ার দৌড়ে শামিল হন। উন্নত দেশে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত স্বচ্ছ। প্রকৃত মেধাবীরাই সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। আর এই শিক্ষকরা ক্যারিয়ারের শুরুতে শিক্ষা ও গবেষণায় নিজেকে খুব বেশি নিয়োজিত রাখেন। এই সময়ে তরুণ শিক্ষকরা সমৃদ্ধ ক্যারিয়ার গড়তেই ব্যস্ত থাকেন।

কোনভাবেই প্রশাসনিক দায়িত্বে যেতে ইচ্ছুক হন না। আমাদের দেশেও মেধাবীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হন। প্রকৃত মেধাবী শিক্ষকদের নিয়ে আমাদের উদ্বেগের কোন কারণ নেই। তারা প্রতিনিয়ত মেধার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন ঠিকই। তারা কোন পদ পদবির ধারও ধারেন না। এ রকম শিক্ষকের তালিকাটি কম নয়। কিন্তু মেধাবীদের পাশাপাশি ফাঁকফোকর গলিয়ে কিছু লেবাসধারী তথাকথিত ভাল রেজাল্টের সার্টিফিকেটধারীও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। এই শিক্ষকদের ছাত্র জীবনের শুরুর পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে খুব একটা ভাল ফলাফল থাকে না। অতটা মেধাবী ছাত্র হিসেবেও পরিচিত থাকেন না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যে কোনভাবে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তথাকথিত ভাল রেজাল্ট করে ফেলেন। আর তাকে ঠেকাই কে? যে কোন উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হবে। রাজনৈতিক তদ্বিরবাজি হোক আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নীল দল আর সাদা দলের ভোট বৃদ্ধির নিয়ামক হিসেবে হোক, যে কোনভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াটিও যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ। বিগত পরীক্ষাসমূহের রেজাল্ট এবং শুধুমাত্র মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ হয়ে থাকে। এত সহজ প্রক্রিয়ার কারণেই কোন কোন ক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতা, আদর্শহীন মানুষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করে। কতদূর সত্য জানি না, ছাত্র জীবনে একজন শিক্ষক সম্পর্কে এমন কথাও শুনেছি যে, প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছেন; কিন্তু সহজ প্রক্রিয়ার কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, সেই শিক্ষক নাকি পরবর্তীতে তাঁর কর্মজীবনের এক পর্যায়ে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকও নির্বাচিত হয়েছেন। জানি না ওই শিক্ষক এখন উপাচার্য মনোনয়ন দৌড়েও শামিল হয়েছেন কিনা! অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় নিয়োগ প্রক্রিয়াটিরও সংশোধন আনা জরুরী হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অভিভাবক প্রতিষ্ঠান বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অধীনেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সিলেকশন বোর্ড বা একটি কমিটি করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ মঞ্জুরি কমিশনকে তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষকের চাহিদাপত্র পাঠাবে। মঞ্জুরি কমিশনের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সিলেকশন বোর্ড বা কমিটি পিএসসির আদলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। এতে করে অনেকাংশেই যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করি।

শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার দুর্বলতার সুযোগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এভাবেই এক শ্রেণীর শিক্ষক গড়ে উঠেছে, যাদের শুরু থেকেই প্রধান কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদ-পদবি দখল করা। শিক্ষা ও গবেষণা তাদের কাছে মুখ্য নয়। সবেমাত্র স্নাতকত্তোর পাস করে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে যে সময়টিতে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান এবং এমফিল, পিএইচডি করার কথা, সে সময়টিতে এই শিক্ষকরা শিক্ষক রাজনীতির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ বাগিয়ে নিতে ব্যস্ত সময় পার করেন। এই শিক্ষকরা আবার যে এমফিল, পিএইচডি করেন না, তাও কিন্তু নয়। সেটিও টেনেটুনে কোন রকমে করে ফেলেন। নামের আগে একটি ডক্টরেট লাগাতে পারলে তাকে আর ঠেকানোর সাধ্য কার। পিএইচডি গবেষণা যে কীভাবে করতে হয়, তার জন্য একটি প্রাথমিক উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াতে প্রয়োজন এটি বেমালুম ভুলে যান এই শিক্ষকরা। বাকি জীবনে তাদের আর সচরাচর গবেষণা করতে দেখা যায় না। তদুপরি পিএইচডি করে এসে এই শিক্ষকরা তাদের সেই প্রশিক্ষণ কাজে না লাগিয়ে কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নেতা আবার কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রশাসনিক পদ অর্জন করাটাকেই প্রধান লক্ষ্য মনে করেন। যত পদ-পদবি অর্জিত হবে, ততই যেন ভবিষ্যতের একটি চূড়ান্ত পদ অর্জন সহজ হয়ে উঠবে। এই চূড়ান্ত পদটিই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। না হলে নিদেন পক্ষে উপ-উপাচার্য পদটি বাগানো চাইই চাই। এই শিক্ষকরা রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলার জন্যও মরিয়া হয়ে ওঠেন। এক প্রকার প্রতিযোগিতা হতেও দেখা যায়। যার যত বড় নেতার সঙ্গে যোগাযোগ, তিনি তত কাঙ্ক্ষিত উপাচার্য পদটি সহজে অর্জন করতে পারেন।

বড় জাতীয় নেতার সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে কিংবা নেতার মন জয় করে চলতে পারলে একবার না একাধিকবারও উপাচার্য হওয়া যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এক ব্যক্তি একাধিকবার উপাচার্য মনোনীত হওয়ার প্রবণতাও বেড়ে গেছে। আবার নেতার বিরাগভাজন হলে সঙ্গে সঙ্গে ছিটকেও পড়তে হয় এমন ঘটনাও অহরহ ঘটছে।

শুধু রাজনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করে মনোনীত হওয়া উপাচার্যরা কী পরিমাণ বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পত্রিকার শিরোনাম দেখলেই তা সহজে অনুধাবন করা যায়। নিশ্চিত করে বলতে পারি, এই বিতর্কিত উপাচার্যদের ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যদি তদন্ত করে দেখা হয় তা হলে বহু রোমহর্ষক কাহিনী বেরিয়ে আসবে। উপাচার্য পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতি, নারী কেলেঙ্কারি, নিয়োগ জালিয়াতি, প্রতারণা, ক্যাম্পাসে দিনের পর দিন অনুপস্থিতিসহ নানা অভিযোগে অভিযুক্ত এই বিতর্কিত উপাচার্যরা। নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়া সত্ত্বেও কিছুদিন আগে একটি পুরনো বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ‘বঙ্গবন্ধু চেয়ার’ পদ দখল করে আরও এক ধাপ এগিয়ে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশিরভাগ বিশ্বদ্যিালয়ের উপাচার্য বিদায় হচ্ছেন বিক্ষোভ ও সমালোচনার মুখে। নিজেদের বিতর্কিত কর্মকা-ের কারণে সম্মানিত পদটির বিদায় ঘটছে চরম অসম্মানের সঙ্গে, যেটি কোনভাবেই কাম্য নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা উপ-উপাচার্য হওয়াটাই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে হবে ? কী লাভ এই পদে আসীন হয়ে? আপনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে কে মনে রাখবে একবার ভাবুনতো? তবে আপনি না চাইতেই যদি দায়িত্ব কাঁধে এসেই যায়, তা হলে সেটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করুন, দেখবেন প্রশংসিত হবেন। এমন উদাহরণও আমাদের দেশে আছে। এই নিবন্ধটি শুধু যারা সীমাহীন বিতর্কের জন্ম দিয়ে চলেছেন, তাদের কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করে। যারা সত্যিকারের মেধাবী এবং উপাচার্য হিসেবে ভাল করছেন, তাঁদের সাধুবাদ জানাই; জানাই শুভ কামনা।

বরং উপাচার্য হওয়ার দৌড়ে শামিল না হয়ে শিক্ষা, গবেষণা এবং সৃজনশীল দুনিয়ায় নিজেকে নিয়োজিত করুন। দেখবেন আপনার নাম আজীবন শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করা হবে। আপনার সামনে রোল মডেল চান? সেটিও অসংখ্য আছে। রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়ের হাসান আজিজুল হক, সনৎ কুমার সাহা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাল নজরুল ইসলাম, অনুপম সেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বদ্যিালয়ের হায়াৎ মামুদ, আনু মুহাম্মদ, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বদ্যিালয়ের মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, বুয়েটের জামিলুর রেজা চৌধুরী, মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, অজয় রায়, নজরুল ইসলাম, হাসেম খান, হামিদুজ্জামান খান, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, মুনতাসীর মামুন, সৈয়দ মনজুরুল ইসলামসহ অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী শিক্ষকের কথা বলা যায়, যাদের সবার নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়, তাঁরা কিন্তু কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার দৌড়ে শামিল হতে যাননি। চানওনি তাঁদের দেশ ও জাতি ঠিকই মনে রাখবে। বিতর্কিত হওয়ার কারণে কিন্তু আপনাকে কেউ শ্রদ্ধা ভরে স্মরণও করবে না, মনেও রাখবে না। কাজেই আপনিই সিদ্ধান্ত নিন উপাচার্য হবেন নাকি স্বনামধন্য শিক্ষক, গবেষক ও সৃজনশীল দুনিয়ার মানুষ হবেন?

লেখক : গণমাধ্যমকর্মী

tsazzadkadir71@gmail.com

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক: স্বদেশ রায়। সম্পাদক কতৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লি: ও জনকণ্ঠ লি: থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজি: নং ডিএ ৭৯৬। কার্যালয়: জনকণ্ঠ ভবন, ২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন, জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা, ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন), ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dailyjanakantha.com এবং www.edailyjanakantha.com ।। Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com

Developed By Bikiran.Com